OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 374
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 369 - 374
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অনিল ঘড়াই-এর ‘মেঘ জীবনের তৃষ্ণা’ : হাড়ি সম্প্রদায়ের ইতিকথা

আজিমুদ্দিন মণ্ডল
গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suraj.jarur@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Hari community, Roots and reality, oppressed, Brahmin superiority, Caste distinctions, Untouchability, Mainstream, Social identity.

Abstract
Post-colonial writer, Anil Ghrai's popular novel 'Megh Jiboner Trishna' is written about the Hari community. The Hari community has been depicted as the roots and reality of the caste system in our society. They are still oppressed. The process of Brahmin superiority and caste distinctions which became permanent in the social formation of Bengal during the Sena period still survives through various breakdowns. As a result, the social status of the Hari community remained the same and untouchability remains in our society. Through the story of Pawan's family's ups and downs, novelist Anil Ghrai is mainly represented in caste-dominated Hindu society who are not allowed to connect with the mainstream of the society. In the narrative of the novel 'Megh Jiboner Trishna', the picture shows the socio-economic condition of the Hari community, for whom there is a separate system, separate provisions in everything. The people of Hari community mainly spend their lives by rearing pigs, selling skins of dead animals collected from Bhagar to moneylenders or selling fish in the market and they lost their social identity.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিশ শতকের একজন স্বতন্ত্র ঘরানার ঔপন্যাসিক হলেন অনিল ঘড়াই। স্বাধীনতা উত্তর কালের ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই-এর সাহিত্যকৃতিতে প্রধান হয়ে উঠেছে নিরক্ষর, অশুচি, অবর্ণ, ব্রাত্যজনের অন্তঃস্বর। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরে যখন আমরা কৃত্রিম মেধার যুগে পৌঁছে গেছি তখনও আমাদের সমাজেরই একশ্রেণির মানুষ কিন্তু দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কৃষক-শ্রমিক-মজুর প্রতিনিয়ত যে শ্রমের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে পূর্ণাতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁরাই রয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। শুধু তাই নয়, বর্ণশাসিত হিন্দু সমাজব্যবস্থায় তথাকথিত নিচুজাতের মানুষেরাও উচ্চবর্ণের দ্বারা প্রতিনিয়ত লাঞ্চিত-নিপীড়িত। সমাজের নিচুতলার এসব প্রান্তিক-শ্রমজীবী মানুষের নিষ্পেষিত ও নিরুচ্চার স্বরকে গুরুত্ব দিয়ে অনিল ঘড়াই তাঁর আখ্যানবিশ্ব নির্মাণ করেন। দলিত-প্রান্তিক-নিম্নবর্গীয়দের অন্তঃস্বরকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নিজেকে কখনই অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেননি। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 374
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দলিত মানুষ আমার সম্পদ। আমি তারই উৎস। দলিত মানুষ আমার কাছে আশ্চর্য এক উর্বর মেঘ। তারা আমার বুকের ভেতর, মাথার ভেতর সব সময় ভাসছে। সেই অর্থে আমি বঞ্চিত নই। বরং বলতে পারি, এই পৃথিবীতে আসল মানুষগুলো এসেছে আমার গল্প উপন্যাসে। আমি নকল মানুষদের ভুরিভোজ নিয়ে স্নো পাউডার নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পাতা ভরাই নি"[১]

আপন সারস্বত সাধনা সম্পর্কে অনিল ঘড়াই-এর এই সত্যোচ্চারণের সার্থকতম প্রকাশ তাঁর 'মেঘ জীবনের তৃষ্ণা' উপন্যাস।

আর্যগণ বিশেষ বিশেষ সুবিধা ভোগ করার জন্য একসময় যে জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম প্রথা চালু করেছিল সেই জাতিভেদ প্রথার শেকড় আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থার কতটা গভীরে প্রোথিত তা এই হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবনচিত্রই তার প্রমাণ। তাঁরা এখনও নিপীড়িত, দলিত এবং পরাশ্রিত। এককথায় মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত এক জাতি। ঋক্‌বেদের পুরুষ সূক্তে (১০ম মণ্ডল, ৯০তম সূক্ত) উল্লিখিত আছে যে, বর্ণভেদ জন্মগত। অর্থাৎ জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণীত, ইচ্ছে করে এর কোনও ব্যত্যয় ঘটানো যায় না। এর একধাপ এগিয়ে গিয়ে চতুর্বর্ণচিন্তামণিকার হেমাদ্রি একসময় বলেছিলেন যে, -

> "শূদ্রের দত্ত বস্তু যদি ব্রাহ্মণ নিজেও পাক করেন তবে তাহাও শূদ্রগৃহে বসিয়া খাইলে পাতক হয়।"[২]

আমাদের মনে হয় যে, জাতবর্ণের দাসত্ব মোচনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বাণী। সেন আমলে বাংলার সমাজ গঠনে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতপাতের ভেদাভেদের যে প্রক্রিয়াটি স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল তা নানান ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে এখনও টিকে রয়েছে। ফলে এই হাড়ি সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। বর্ণহিন্দুরা এখনও তাঁদের অস্পৃশ্য-অচ্ছুত বলেই গণ্য করেন এবং তাঁদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলেন। স্বভাবতই তথাকথিত সভ্য সমাজের কাছে যাঁরা অস্পৃশ্য-অচ্ছুত-অপবিত্র জাতি হিসেবে পরিগণিত তাঁরা এখনও প্রদীপের সলতের আলোয় রাতের কাজ সারে। অভাব তাঁদের নিত্যসঙ্গী। উপন্যাসের আদ্যন্ত জুড়েই ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই পূর্ব মেদিনীপুরের হাড়িসাইয়ে ও তার আশেপাশের গ্রামে বসবাসকারী হাড়ি সম্প্রদায়ের নিত্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়ার কাহিনিই ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা যে এখনও হীন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষ অর্থাৎ এই হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত যে, শূকর প্রতিপালন, মহাজনের কাছে ভাগাড় থেকে সংগৃহীত মৃত পশুর চামড়া বিক্রি কিংবা হাটে হাটে গিয়ে মাছ বিক্রি করেই জীবন অতিবাহিত করে তা আমাদের জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই।

ব্রজবুড়া এই গ্রামের মাতব্বর। বিপদে-আপদে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাঁরই কাছে ছুটে যায় সৎ পরামর্শের জন্য। তিনি সাধ্যমতো তাঁদের পাশে দাঁড়ান। তাঁর দুই ছেলে নকুল আর সহদেব। বড় ছেলে নকুলদেব মেদিনীপুরের সদর হাসপাতালের ঝাড়ুদার। সে সপরিবারে সেখানেই থাকে। আর ছোটো ছেলে সহদেব একজন যাত্রাভিনেতা। বছরের অধিকাংশ সময় সে যাত্রাপালা নিয়েই মেতে থাকে। তাঁর আয় খুবই সীমিত। এহেন অবস্থায় সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়ে ব্রজবুড়ার ওপর। সে তাঁর বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া শরীর নিয়ে চারজনের অর্থাৎ পবন-সুভদ্রা-মেনি-হৈমবুড়ির নুনভাত জোগাড়ের দায়িত্বকে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। অভাবের জাঁতাকলে পিষ্ট সংসারের ছাতা সামাল দেওয়া তাঁর একার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। তবুও চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে সে নাতি পবনকে নিয়ে ভাগাড়ে যায় প্রতিনিয়ত।

কিন্তু সেখানে তাঁকে প্রতিদিনই অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। কেননা তাঁর কষ্টার্জিত চামড়ায় প্রতিদিনই ভাগ বসাতে হাজির হয় গ্রামের মাতব্বর ধর্মাবাবুর চ্যালারা। তারা দৈহিক বল প্রয়োগ করে ব্রজবুড়ার কাছ থেকে চাম কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। ঐ চামড়ার ওপরেই যে ব্রজবুড়ার পুরো সংসার নির্ভরশীল তা তারা মানতে চায় না। ব্রজবুড়ার কাকুতি-মিনতি তাদের কানেই ঢোকে না। এমনই একজন ধর্মাবাবুর চ্যালা হল হরিয়া। সে একদিন বিকট হেসে ব্রজবুড়ার কাছ থেকে চামড়ার পুঁটুলিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় কুকুরগুলোর দিকে। চোখের পলকে হামলে পড়ে কুকুর। যে মানুষটার পুরো পরিবার একটি চামড়া বিক্রির আয়ের ওপর নির্ভরশীল সেখানে হরিয়ার এই অমানবিক-অমানুষিক আচরণ সমাজের

হর্তাকর্তারা দেখেও না দেখার ভান করে থাকে। উলটে পবন এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ হরিয়াকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে গ্রামের হর্তাকর্তা ধর্মাবাবু পবনকে শাস্তি দিতে উঠেপড়ে লেগে যায়, -

> "ধর্মাবাবুর পুরুষ্টো হাতের থাপ্পড়ে ডানে-বাঁয়ে হেলে গেল পবনের মাথা। চোখে আঁধার দেখতেই গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল সে। ধর্মাবাবু থাপ্পড় মেরেও খুশী নয়; কার্তিককে বলল, বাঁধ শালাকে। বেঁধে গাছের উপর ঝুলিয়ে দে। কত ডাকাত আমি শায়েস্তা করে ছাড়লাম-এ হারামজাদা তো সেদিনের ছেলে।"[৩]

সমাজের প্রভাবশালীরা যে অনাদিকাল ধরে এভাবেই হাড়ি সমাজভুক্ত মানুষদের ওপর অমানুষিক পীড়ন করে চলেছেন সেই সত্যকেই ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন। হাড়িদের প্রতি উঁচুজাতের মানুষদের অন্যায়-অত্যাচার, শাসন-শোষণের পাশবিক-বীভৎস রূপ অনিল ঘড়াই-এর চোখ এড়িয়ে যায়নি। জীবনসন্ধানী ঔপন্যাসিকের আলোচ্য উপন্যাসের ন্যারেটিভে এই রূঢ় অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন হতে দেখি আমরা।

এই ধর্মাবাবুর কীর্তি হাড়িসাইয়ে গ্রামের কে না জানে। সে অসৎ, প্রতারক, ক্রূর, অভিসন্ধিপরায়ণ এবং লোভী। তাই তো আমরা দেখি, শ্রমিকের দরকার হলে ধর্মাবাবুর লোক এসে হাড়িসাইয়ের লোকগুলোকে ধরে নিয়ে যায়। ন্যূনতম যা মজুরি দেয়, তাই বিনা প্রতিবাদে হাত পেতে নিতে হয় তাঁদের। কেননা প্রতিবাদ করলে তাঁদের আর রক্ষা নেই। ধর্মাবাবুর পোষা চ্যালাচামুণ্ডারা এসে অতর্কিতে হামলা চালায় তাঁদের ওপর। অতিরিক্ত বর্ষায় যখন চাষের কাজ হয় না তখন তিনি চরা সুদে দাদন দেয় গ্রামের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষদের। তিন বস্তা ধান দাদন দিলে পাঁচ বস্তা ধান ফেরত দিতে হয়; না দিলে রক্ষে নেই। জোর যার মুলুক তার। সমাজপতিদের এই বর্বরতাই হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে, -

> "তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেল-দলিতরা বারবার প্রতারিত হলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক দলের দাবার ঘুঁটি হলেন, দারিদ্র্য ক্ষুধা, অজ্ঞতা, অপমান, অবিচার, বঞ্চনা-এই সমস্ত সম্পূর্ণ মানবিকতা বিরোধী অবস্থার মধ্যে বাংলার দলিতরা টিকে রইলেন।"[৪]

হাড়িরা যেহেতু নিরক্ষর কিংবা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত এক জনগোষ্ঠী তাই সব কিছুতেই ধর্মাবাবুর যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থ জড়িয়ে আছে তা তাঁরা বুঝতে পারে না। উলটে তার কথামতো শিক্ষার আলোকহীন কিছু লোক পবনকে ধরে এনে গাছে বেঁধে রাখে। অতঃপর ধর্মাবাবু পবনকে নাকখত দিতে বলে। কিন্তু পবন ধর্মাবাবুর অন্যায় আবদারের কাছে মাথানত করে না। নিজের জীবনকে সে এই অসম লড়াইয়ে বাজি ধরে।

অবশেষে মানবসেবায় রত দুলুবাবুর বদান্যতায় পবন ছাড়া পায়। উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, দুলুবাবু হলেন একজন জনদরদি মানুষ। যেখানে মানুষ শোষিত-বঞ্চিত, যেখানে জীবনের সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশ বিড়ম্বিত সেখানেই তাঁর সংবেদনশীল মনের গভীর মমত্ব-ভালোবাসা প্রকাশিত। এই দুলুবাবুর কাছে পবন তাঁর পরিবারের দরিদ্র্যতার কথা তুলে ধরলে দুলুবাবু তাঁকে মাছ ব্যবসা করে সংসারের হাল ফেরাতে বলে। অবশেষে দুলুবাবুর কাছ থেকে পবন আর্থিক সহায়তা ও পুরোনো সাইকেল পেয়ে সমুদ্রের নোনা মাছের ব্যবসা শুরু করে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করে, -

> "দুলুবাবুর দয়ায় সে এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে-যা তার মনোবলকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে। অভাবের সংসারে মেহনতের মূল্য অনেক। পবন জানে-পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই, একমাত্র কঠোর পরিশ্রমই পারে-তাদের হেলে পড়া সংসারটাকে ঠেকা দিতে।"[৫]

মায়ের আশীর্বাদ, দাদুর পরামর্শ, ছোটো বোন মেনির ভালোবাসা আর নিজের অদম্য জেদকে সঙ্গী করে পবন নেমে পড়ে হেলে পড়া সংসারের হাল ধরতে। কিন্তু সেখানেও বাধার সম্মুখীন হতে হয় পবনকে। আর্থ-সামাজিক অসমতার দর্শন মেলে এখানেও। সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সমন্বয়সাধনের কথা শুধু সংবিধানের বুলি হয়ে থেকে গেছে, বাস্তবে তার দর্শন মেলা ভার। তাই তো আমরা দেখি, যাদের পুঁজি পবনের থেকে অনেক বেশি তারাই মহাজনের কাছ থেকে আগে মাছ পায়। অবশিষ্ট থাকলে পবনের মতো নতুনরা মাছ কেনার সুযোগ পায়। অবশেষে নারাণ সাউ পবনের দিকে তাঁর সাহায্যের

হাত বাড়িয়ে দেয়। তাঁর বদান্যতায় পবন নিজের সাধ্যমতো সমুদ্রমাছ কেনে এবং কেনা সমস্ত মাছ হাটে হাটে বিক্রি করে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে আসে।

কিন্তু সমুদ্র মাছের কারবার যে বছরের সব দিন সমান যায় তা নয়। উত্তরা হাওয়ায় মাছেরা সব নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে সারণি জালে ঠিকমতো মাছ ধরা পড়ে না। তখন মাছ ব্যবসায়ীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। গ্রামে কাজের অভাব থাকায় পবনকেও তখন বেকার হয়ে দিন কাটাতে হয়। পবনের একার আয়ে এত বড় সংসার তবুও ধুঁকো বকের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। কিন্তু তাঁর বেকারত্ব সব কিছু বানচাল করে দেয়। আবার অভাবের হিমসাপ ছোবল মারে তাঁর পরিবারে। তখন বাধ্য হয়ে ছোটো বোন মেনিকে যেতে হয় গোবর কুড়োতে; ব্রজবুড়াকে যেতে হয় ভাগাড়ে। এমন একটা কঠিন সময়ে প্রত্যহ এতগুলো মানুষের অন্নসংস্থানের উপায় নির্ধারণ করা মুখের কথা নয়। ব্রজবুড়া এসব চাপের কাছে মাথা নত না করেই দিব্যি মাথা উঁচু করে বেঁচে ছিল, সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছিল পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু আধপেট খেয়ে যে মানুষটা বাল্য-যৌবন কাটিয়েছে বার্ধক্যে এসে সেই মানুষটার শরীরে যে রোগ এসে বাসা বাঁধবে এটা তো স্বাভাবিক। ফলে অপুষ্টির কবলে পড়ে ব্রজবুড়াকে একসময় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ওপারে পারি দিতে হয়। এমতাবস্থায় সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পবনের কাঁধেই এসে পড়ে। দাদুর অবর্তমানে সে অভিভাবকের ভূমিকায় নামে। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময় মাছ ব্যবসায় মন্দা লেগেই থাকে বলে অভাব-অনটনের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনকে সঙ্গী করে তাঁদের বেঁচে থাকতে হয়। এরা হচ্ছে তাঁরাই যাঁরা, -

> "দেশের নাগরিক হিসেবে লেখাপড়া করতে পারার, নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারার, ইচ্ছামতো জীবন কাটানোর অধিকার এঁদের এখনও অনিশ্চিত।"[৬]

তবুও সে হাল ছাড়তে রাজি নয়। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যের প্রকোষ্ঠ থেকে পরিবারকে মুক্তি দেওয়াই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

যে-কোনো ব্যবসাই নির্ভর করে পুঁজির ওপরে। পুঁজিগত দিক থেকে যাঁরা দুর্বল তাঁরা ব্যবসায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। পবন সেই দলের। আর হবে নাই বা কেন? আজও তো ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের মানুষই প্রভূত বিত্তের অধিকারী। আর যাঁদের জাতিগত পরিচয় বৈশ্য তাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকে নিঃস্ব, রিক্ত এবং সর্বহারা। তাঁরা আজও সীমাহীন অসাম্য-অপমান, শোষণ এবং দারিদ্র্যের শিকার। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়েও তাঁদের প্রাপ্তি কেবল ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভ। কিন্তু তাঁদেরই গণতান্ত্রিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত সরকার তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কোনও মাথা ঘামায় না। সংসদের বাতানকুল ঘরে বসে তারা যে নীতিগুলির প্রণয়ন করে সেগুলি প্রণয়নের সময় ওই বিশাল জনগোষ্ঠীর কোনও অংশগ্রহণ থাকে না। ফলে শাসকরা শাসক হিসেবেই সমাজে অধিষ্ঠিত থাকেন। আর সাধারণ মানুষ প্রজাই থেকে যান। কয়েক দশক ধরে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর এই অমোঘ নিয়ম চেপে বসেছে। আর তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে এসব অনগ্রসর, দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলিকে। স্বাধীন ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণ মানুষেরা সর্বক্ষেত্রে চাতুরির খেলাতে জয়ী হয়ে অমৃত পান করে চলেছেন। আর অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলির জন্যে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যের হলাহল পড়ে আছে। ছিন্নবস্ত্র পরে, উচ্ছিষ্ট খেয়ে তাঁরা ভূমির ওপর শয়ন করেন। এককথায় তাঁরা প্রলেতারিয়েত। ফলে ব্যবসায় থই পায় না পবন।

এদিকে দাদুর মৃত্যু তাঁকে পচা ফুলের মতো আরও অসহায় করে তোলে। ফলে সব দিক থেকে পবন দিশেহারা হয়ে পড়ে। অভিভাবকহীন সংসারে সে ভীষণ রকমের অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তখন পবনের চোখের সাদা জমিতে দুঃখের মেঘ চরে বেড়ায়। কিন্তু সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে তো আর উনুনে হাঁড়ি চড়বে না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে মাছের কারবারের ওপরই নির্ভর করতে হয়, -

> "কাজ না করলে সংসারের হাঁড়ি চড়ে না। হৈমবুড়ির ধাইগিরিতে সংসারের রাশ টেনে রাখা মুশকিল।"[৭]

মা সুভদ্রা, ছোটো বোন মেনি, দিদা হৈমবুড়ি তাঁকে ধরেই তো বাঁচতে চায়। তাঁদের আশার গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাক পবন এটা চায় না। তাই শরীরে ক্লান্তির ছাপ দেখা দিলেও সাইকেল নিয়ে চলে যায় মাছখটিতে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 374
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজগঠনের ইতিহাসে নানান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু এখনও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চোখে যাঁরা অবর্ণ তাঁদের মূল অবস্থানটা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। পবন ও তাঁর পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থানই তার প্রমাণ।

সব দিন যে পবনকে নিরাশ হয়ে মাছখটিতে থেকে ফিরে আসতে হয় তা নয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পবন কোনো কোনো দিন অল্প দামে ভালো মাছ পেয়েও যায়। তখন মনে খুশির ঝিলিক নিয়ে সে মাছ বেচতে যায় হাটে হাটে। পবন মূলত চোরপালিয়ার হাট, খড়িকাহাট ও মোহনপুর হাটে মাছ বিক্রি করতে যায়। সব মাছ যে এক হাটে বিক্রি হয়ে যায় তা নয়। তখন পবনকে আবার সাইকেল নিয়ে অন্য হাটে যেতে হয় মাছ বিক্রি করতে। তবে সব হাটেই তাঁকে মাতব্বরের দাপটে নাজেহাল হতে হয়। তেমনই এক হাট মোহনপুর হাট। এই হাটে পবন বাছা মাছ কিলোপ্রতি পনেরো টাকায় বিক্রি করতে চাইলে মাতব্বর এসে বাধা দেয় এবং নিজের দাপট জাহির করে বলে এ হাটে মাছ বেচতে গেলে তোমাকে দশ টাকাতেই বেচতে হবে। দু-পয়সা লাভ না রেখে পবনও মাছ বিক্রি করতে রাজি হয় না। অবশেষে কাকা দীননাথ এসে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যায়। কিলো প্রতি দুই টাকা লাভ রেখে পবন ১২ টাকা কিলোয় মাছ বিক্রি করে। এভাবেই সমাজের মাথাওয়ালাদের ঝক্কি সামলে পবন নিজের ভাঙা সংসারের হাল টেনে নিয়ে যায়। আসলে, -

> “সৃষ্টির ভিতর দিয়ে এই নিম্নকোটির মানুষেরা পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হবার সংকল্পে ব্রতী। তারা তাদের জীবনের যুগযুগান্তরের অভিশাপ মুছে ফেলে, তমসার গ্লানি দুরীভূত করে, এগিয়ে আসতে চান।”[৮]

তাই তো আমরা দেখি, পবন শত অভাবের ছোবলের কাছে কখনই নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেয়নি। মায়ের হাতের শাঁখায় জমেছে ময়লা, ফেটে গিয়েছে প্লাস্টিকের শাঁখা; দিদার হুপিং কাশি; মাথার ওপর ধেই ধেই করে বাড়ছে ছোটো বোন মেনি। এসব হৃদয়বিদারক দৃশ্যই তাঁর মনোবল বাড়িয়ে দেয়, -

> “পানিপারুলের বাজারে মাছ বিক্রি করে পবন যখন ফিরছিল তখন দুপুরের রোদ চড়ে গিয়েছে মাথার উপর। ক্লান্তিতে নুয়ে আসছিল শরীর। সাইকেলের প্যাডেলে পা দিতে ইচ্ছে করছিল না তার। তবু হাতছানি দিয়ে ডাকে ঘর, ফিরতে হয় মানুষকে।”[৯]

সে একটা কর্মঠ যুবকের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই কর্মঠ যুবকও মাঝে মাঝে সংসারের জোয়াল টানতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় উল্লিখিত আছে যে, রাষ্ট্র সমাজের পশ্চাৎপদ শ্রেণিসমূহের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবে। সেই অনুসারে আমাদের রাজ্যে তপশিলি জাতির জন্য ২২ শতাংশ, তপশিলি উপজাতির জন্য ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণবিধি শিক্ষা-চাকরির ক্ষেত্রে প্রচলিত। তারই কল্যাণে এই শ্রেণির একটা অংশ নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে একথা সত্য। কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। তপশিলি জাতি-উপজাতিদের মধ্যে শতকরা ৫২ জনই পরের জমিতে খেতমজুর কিংবা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত একজন শ্রমজীবী মানুষ।[১০] এই তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রমবিভাজন ঘটেছে। এমনকি এখনও তাঁরা প্রতিনিয়ত সামাজিক নিগ্রহ-লাঞ্চনার শিকার। আলোচ্য উপন্যাসের ন্যারেটিভে চোখ রাখলেই একজন সহৃদয় পাঠক সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

পণপ্রথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ঘৃণ্য প্রথা। এই প্রথার কবলে পড়ে কত নারী যে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তার হিসেব নেই। বিশেষত যে পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেই পরিবারে পণের টাকা জোগাড় করা যে কত কষ্টের তার প্রমাণ পাই পবনের বোন মেনির বিবাহের সময়। তাঁদের সমাজে দাবির বহর ছোটো হলেও অভাবের সংসারে সেটাই জোগাড় করা কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে পড়ে। বিশেষত ছোটো মাছব্যবসায়ী পবনের পক্ষে, -

> “আমাদের সমাজে দাবীর বহর কিছুটা খাটো। ঘড়ি-সাইকেল-আংটি আর একটা টেপ কিংবা রেডিও দিলেই হয়ে যাবে। এছাড়া ঘর খরচ আর লোক খাওয়ানোর খরচ। সব মিলিয়ে সে তো অনেক টাকার দরকার।”[১১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 369 - 374
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না পবনের পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা। কিন্তু তবুও পবন দু-চোখে স্বপ্ন দেখে। কেননা স্বপ্ন না দেখলে মানুষ মরে যায়; স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের কাজ। আর এই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বলেই পবন বোনের বিয়ে দিতে পেরেছে ভালো ঘরে; মায়ের, দিদিমায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরেছে সর্বদা। আসলে পবন হল এমন এক অন্ত্যজশ্রেণির চরিত্র যে যুগের বিষণ্ণতাকে, দারিদ্র্যের জ্বালাকে দূরে সরিয়ে রেখে নবজীবনের গান গাওয়ায় মুখর।

"এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য;/ তবু শেষ সত্য নয়।"[১২]

এই আদর্শেই পবন উজ্জীবিত থেকেছে আজীবন। সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কিংবা জীবন তৈরির খেলায় পবন একরোখা তীর।

উপন্যাসের প্রতিবেদনে হাড়ি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যেসব মানুষদের কথা উঠে এসেছে তাঁরা হলেন বাঁকা, গঁড়া, রাধিকা, ধরণীবুড়া, যুগলবুড়া প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই সম্পদে দরিদ্র, নিরক্ষর অথবা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও অতি সামান্য আয় করেন। জীবনকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের কোনও সামাজিক বা অর্থনৈতিক সুযোগ নেই। তবে তাঁদের জীবনলহরির খুব একটা গভীরে প্রবেশ করেননি ঔপন্যাসিক। পবনের পরিবারের চড়াই উতরাই-এর কাহিনির মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই মূলত বর্ণশাসিত হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যাঁদেরকে অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ তকমা লাগিয়ে সমাজের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেওয়া হয় না, যাঁদেরকে ধর্মশালা থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান কিংবা বিয়ে-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সবকিছুতে যাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা, পৃথক বিধান সেই হাড়ি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের চিত্রটিকে আলোচ্য উপন্যাসের ন্যারেটিভে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শঙ্খ ঘোষ একদা বলেন যে, -

"সচেতন লেখকের কাজ তার চারপাশে তাকিয়ে, আর তার নিজের মধ্যে তাকিয়ে, সত্যটাকে বুঝতে শেখা আর সেই সত্যকে প্রকাশ করা, নিজের কাছে কোনোরকম ফাঁকি না রেখে।"[১৩]

উপন্যাস পাঠে আমরা দেখলাম যে, জীবনশিল্পী অনিল ঘড়াইও সত্যধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তিনি নিরাসক্ত-নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে হাড়ি জাতির ইতিবৃত্তকে আলোচ্য উপন্যাসের ন্যারেটিভে তুলে ধরেছেন।

Reference:

১. মাঝি, সুনীল ও ভবেশ বসু (সম্পা.), *অনিল ঘড়াই পরিক্রম,* তূর্য, ২০১৫, পৃ. ৪৩৯
২. সেন, ক্ষিতিমোহন, *জাতিভেদ,* বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃ. ৫৪
৩. ঘড়াই, অনিল, *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা,* গ্রন্থতীর্থ, ১৯৬০, পৃ. ৪৫
৪. বালা, যতীন, *দলিত-রচনা দলিত-লেখক,* গাঙচিল, ২০২০, পৃ. ৮৯
৫. ঘড়াই, অনিল, *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা,* গ্রন্থতীর্থ, ১৯৬০, পৃ. ৫১
৬. রাণা, সন্তোষ ও কুমার রাণা, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী,* গাঙচিল, ২০১৮, পৃ. ৯
৭. ঘড়াই, অনিল, *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা,* গ্রন্থতীর্থ, ১৯৬০, পৃ. ১১৩
৮. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, দলিত সাহিত্যের দিগ্‌বলয়, একুশ শতক, ১৯৯২, পৃ. ৮৮
৯. ঘড়াই, অনিল, *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা,* গ্রন্থতীর্থ, ১৯৬০, পৃ. ২০১
১০. আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক (খণ্ড এক),* অনুষ্টুপ, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৬
১১. ঘড়াই, অনিল, *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা,* গ্রন্থতীর্থ, ১৯৬০, পৃ. ১৯১
১২. দাশ, জীবনানন্দ, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ১৩৬১, পৃ. ৫৫
১৩. বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১৯ সংখ্যা, পৃ. ২৪